IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নারী স্বাধীনতা ও মধ্যবিত্তের উত্তরণ : প্রচেত গুপ্তের ‘ধুলোবালির জীবন’

জয়ত্রী দত্ত চৌধুরী, গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর

Abstract : Financial independence is proportionately related with social independence. Due to the financial independence, women are breaking free from traditional mindsets and old values. As a result of financial self-reliance, women's self-confidence is increasing, allowing them to make important life decisions in their lives independently, which was once unimaginable for women. Women have always been identified through their relationships with men - as a daughter, wife, or mother. However, with financial stability, women are now learning to establish their own identities and live with dignity. This is exemplified in Pracheta Gupta's novel **'Dhulobalir Jibon'**. The text discusses how financial independence is empowering women to break free from traditional societal expectations, pressure and imposed norms and rules, and establish their own identities, leading to increased self-confidence and autonomy in decision-making.

Keywords : Financial Independence,breaking mediocrity, women's ambitions, Marital relationship, self-confidence, Feminine Language.

ভূমিকা :

নারীর স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে চিন্তাভাবনার উন্মেষ তা মূলত শুরু হয় পাশ্চাত্য দেশগুলোতে। অষ্টাদশ শতকে নারীমুক্তির প্রথম পথপ্রদর্শক এবং একই সঙ্গে বলা যায় প্রচারক মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট, যিনি তাঁর বই "A Vindication of the Rights of Woman" (1792) এ প্রথম নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন।
অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে নারী স্বাধীনতার মূল কথা, মূলত সেখান থেকেই আমরা প্রথম তা জানতে পারি। নারীশিক্ষা, সমানাধিকার, এবং সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি নারী অধিকার আন্দোলনে প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই নারী স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা এবং আন্দোলন সমাজের প্রতিটি স্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছে, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। পরবর্তীতে নারীবাদ নানান পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে।

নারীকে সর্বকালেই দেখা হয় পুরুষের পরিচয়ে। কুমারী হলে পিতৃপরিচয়ে, বিবাহিত হলে প্রথম পর্যায়ে স্বামীর পরিচয়ে এবং পরবর্তীতে সন্তানের ‘মা’ এর পরিচয়ে। নারী ‘উনমানব’, ‘নারীর বুদ্ধি হাঁটুতে’,নারী ‘ভোগ্যপণ্য’ - এরকম বহু কথা আমরা সাহিত্যে পেয়ে থাকি। ক্রমে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থানও পরিবর্তিত হতে থাকে। অন্তঃপুরের অবস্থান থেকে একসময় তারা বাইরে বেরিয়ে আসে। উনিশ শতকের নারীরা বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে জীবনযাপন করলেও তাদের অধিকারের জন্য শুরু হওয়া সংগ্রাম পরবর্তী সময়ে নারীবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। উনিশ শতকের শেষভাগকে এই যাত্রার উন্মেষ পর্ব বললে বিশ শতককে বলা যায় বিকাশ পর্ব এবং একুশ শতকে এসে এই যাত্রা পূর্ণতা লাভ করে বললে অত্যুক্তি হয় না। যুগ-যুগ ধরে মেয়েদের জীবন, স্বপ্ন, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের বন্ধ পথগুলো আজ শিক্ষার অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে উন্মুক্ত হয়ে যায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মেয়েদের জীবনে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং ব্যক্তিগত

অবস্থানকে পুনর্গঠিত করেছে। বর্তমানে নারী চরিত্রের যে বিবর্তন আমরা দেখতে পাই সেটা মূলত সমাজের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের যে পুরনো নৈতিকতা, সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈবাহিক নিয়ম-কানুন বা বিবাহিত মেয়েদের যে চিরাচরিত জীবন-যাপন প্রণালী, সেগুলো ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যাচ্ছে। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে এবং এই আত্মকেন্দ্রিকতার প্রেক্ষিত থেকে পুরনো কাঠামোকে ভেঙে ফেলার প্রয়াস অহরহ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ঘটে চলেছে। সেরকমই একটি জীবনের উপস্থাপন ঘটেছে প্রচেত গুপ্তের 'ধুলোবালির জীবন' নামক উপন্যাসে।

উপন্যাসের নায়ক বিধান মূলত মধ্যবিত্ত মানসিকতা পোষণকারী। বিধান এই উচ্চাশালোভী ইঁদুরদৌড়ের পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অব্দি অর্জন করতে পারে না, এমনকি চায়ও না। স্ত্রীর অহরহ ঠাট্টা, অপমান সত্বেও সে তার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। কাহিনীর নায়িকা শ্রীজিতা ঠিক তার বিপরীত। সে শিক্ষিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জেদি। বাবার অতিরিক্ত অন্যায় শাসনের প্রতিবাদে বাবার বিপক্ষে সে বিয়ে করে বসে বিধানকে যে কিনা তার ঠিক বিপরীত চরিত্রের এক অতি সাধারণ, জীবনের প্রতি উদাসীন, এক অতি ভালো মানুষ, যার নিজের কোনো আশা-আকাঙ্খা নেই জীবনের কাছে।
সম্পর্ক যদিও দাঁড়ায়নি। বিয়ের কিছু বছরের মধ্যেই শ্রীজিতা বোঝে যে, সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিধানকে বিয়ে করে যে অভাবের সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে সেখান থেকে সে বেরোতে চায় এবং এই সব কিছুর জন্য সে যেকোনো পথ অবলম্বন করতে পারে। কারণ এতো দিনের দীর্ঘ জীবনে সে বুঝে গেছে যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যও থাকতে হয় এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগ জানতে হয়। এই উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র হলো ঝুমুর যে বিধানের জীবনে হঠাৎ করেই আসে আবার হঠাৎই চলে যায়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে নারী স্বাধীনতার মূলে কাজ করে তা আমরা উপন্যাসের শ্রীজিতার মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি। তার ভাষায় —
"তোমার আমার একসঙ্গে থাকার খেলাটা এইবার শেষ করলে মনে হয় ভাল হবে। এর বেশি গড়াতে দিলে দু'জনের জন্যই খারাপ হবে। শ্রীজিতাই উকিলের সঙ্গে কথা বলেছিল।.. সব শুনে প্রেমনাথ বলেন, "তাহলে থানায় গিয়ে একটা ফোর নাইনটি এইট করে দিন। মামলা ইজি হবে।" শ্রীজিতা বলেছিল, "লড়াইয়ের দরকার হবে না। মিউচুয়াল।"১

মেয়েদের জীবন মানেই ঘর-বর-সংসারের চেনা ছক। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের সংজ্ঞায় বাঁচাটাকেই বেছে নিতে চাইছে একালের শ্রীজিতারা। বিধানকে বিয়ে করাটা ছিল তার বাড়ির প্রতি 'বিদ্রোহ'। এমনকি, বিধানকে বিয়ে করার জন্য বাড়ির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছাড়তে হয়েছে শ্রীজিতাকে। একমাত্র মেয়ের 'ভাল বিয়ে' দেওয়ার জন্য মেয়ের কম বয়স থেকেই উঠেপড়ে লেগেছিলেন অনিমেষ বসু। শ্রীজিতা কলেজে পড়ার সময়েই স্কুলমাস্টার পাত্র এনে হাজির করেছিলেন। পারলে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দেন। শ্রীজিতারা যথেষ্ট সচ্ছল,ধনীই বলা উচিত। আসলে বিয়ের জন্য এই তাড়াহুড়োর কারণ ভদ্রলোক মেয়ের ব্যাপারে ছিলেন অতিরিক্ত পজেসিভ। তাঁর ধারণা হয়েছিল, যতই লেখাপড়া শেখানো হোক, তাঁর সুন্দরী মেয়ে হয় ভুল করবে, নয় ফাঁদে পা দেবে। এমন কাউকে নিজে থেকে বিয়ে করে বসবে যা তার জন্য সর্বনাশ হবে। সেই সঙ্গে মেয়েটা হাতছাড়াও হবে। এটা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া হবে অসম্ভব। অনিমেষ বসু একজন রাগী, সেকেলে মনের দাপুটে লোক। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় মেয়ে ভালো রেজাল্ট করলেও তাকে নিজের পছন্দমতো নামী কলেজে ভর্তি হতে দেননি অনিমেষ, কারণ কোএডুকেশন। ছেলেদের সঙ্গে মেয়ে পড়বে, এটা তিনি মানতে পারেননি। শ্রীজিতা বলতো এখন ছেলে-মেয়ে সব সমান। এসব মান্ধাতা আমলের চিন্তাধারা থেকে তার বাবাকে বেরিয়ে আসার কথা বরাবরই বলতো সে। যদিও তার প্রত্যুত্তরে অনিমেষ বসু বলতেন এসব জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা টিভির পর্দায় আর খবরের কাগজের পাতায় চলে বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। তাই কলকাতার ভালো মেয়েদের কলেজেই শ্রীজিতাকে ভর্তি করাতে চান তিনি। আসলে সংসারের সব ছোট বড় সিদ্ধান্তেই এই মানুষটার কথা চূড়ান্ত। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতেই তোড়জোর শুরু করলেন মেয়ের বিয়ের জন্য। ডাক্তার ছেলে। রক্ষণশীল মানসিকতায় পুষ্ট শ্রীজাতার মা জয়াও উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন এই ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য। মূলত বোকা এই ধরনের মহিলা স্বামীর দাপটের উপর চিরকালই আস্থাশীল। তিনি মনে করেন দাপুটে মানুষ সংসারের জন্য ভালো। আসলে শ্রীজিতা বোঝে, অনিমেষ বসু মেয়ের একাডেমিক কেরিয়ার চান না, কোন ক্যারিয়ারই চান না। চান, তাঁর পছন্দের কোন ছেলেকে বিয়ে করে সংসারের গর্তে সেঁধিয়ে যাক। জামাই এসে শ্বশুরের সামনে হাত কচলাক। ইউনিভার্সিটির পালা শেষ হওয়ার পর শ্রীজিতা যখন বাড়িতে বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ব্যস্ত, গবেষণা নাকি চাকরির চেষ্টা করবে, এই সময় ফের নতুন পাত্রের খবর এল। শ্রীজিতার পরিষ্কার

বক্তব্য, সে নিজের পছন্দ করা মানুষকেই বিয়ে করবে। অগত্যা সে বাড়িঘর ছেড়ে বিধানের হাত ধরে বেরিয়ে আসে এই ভেবে যে, বিধানের সঙ্গে সংসার করতে গেলে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে কখনও তাকে কবজা করতে চাইবে না। তার স্বাধীন বেঁচে থাকা, লেখাপড়া শিখে ইচ্ছেমতো কেরিয়ার তৈরির বাধা হবে না। কিন্তু সুখের হয়নি তাদের দাম্পত্য জীবন। বিয়ের পর শুধু অভাব নয়, সবকিছুতেই বিধানের উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা এসবকে কেন্দ্র করে রাগ পুষে পুষে একসময় নিজের কাঙ্খিত জীবনের জন্য বিধানকে ডিভোর্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীজিতা। মেয়ে তোয়ার জীবনে বিধানের প্রভাব পড়ুক এটাও চায়নি সে। বিধানকে ডিভোর্স দেয়ার মাঝখানেই একাধিক শারীরিক সম্পর্কে জড়ায় শ্রীজিতা।

বিবাহকে একসময় সমাজে বৈধভাবে একত্রে বসবাস করার পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হত সেখানে আজকের প্রজন্ম লিভ ইন বা ওপেন রিলেশনশিপে ভাল থাকছে। যেসব কারণে আগে বিয়ে করার প্রশ্ন উঠত, তা-ও এখন বিয়ে ছাড়াই পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও নিজের হাতে। ফলে বিশ্বায়িত পৃথিবীতে অসুখী বিয়ে বা ভুল সম্পর্কে থাকার চেয়ে একা থাকা পছন্দের হয়ে উঠছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

আবার, একসময় ঘুম থেকে উঠে বড়দের প্রণাম করে, স্নান করে মন্দিরে যাওয়া, গাছ লাগানো ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা জন্মদিন উদযাপন করতাম। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, মেয়ে তোয়ার জন্মদিনে শ্রীজিতা নিমন্ত্রিতদের জন্য খাবারের পাশাপাশি নাচ-গান ইত্যাদির ব্যবস্থাও করেছে যা আগে আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না -
“শ্রীজিতা বলল– ‘ওই একবারই তো তোয়ার জন্মদিন সেলিব্রেট করেছিলাম’...সেবার সন্ধ্যেবেলা শ্রীজিতা পার্টি দিয়েছিল। তার অফিস কলিগ আর কাজের সঙ্গে যুক্ত এমন কয়েকজনকে ডেকেছিল। বাড়িতে নয়, এয়ারপোর্টের কাছে এক হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে। খাবার, মদ, নাচ - গান সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল... চেনাজানা এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিল।”২

আজকের পৃথিবীতে রেস্টুরেন্ট, বার এবং নাইটক্লাবের সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে মদ্যপান একটি সামাজিক অভ্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনের মান উন্নতির ফলে মানুষ এখন বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে, যার মধ্যে মদ্যপান অন্যতম। এখন শুধু ছেলেরা নয়, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে মদ্যপান স্বাভাবিক জীবনধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। একসময় ঘুম থেকে উঠে বড়দের প্রণাম করে, স্নান করে মন্দিরে যাওয়া, গাছ লাগানো ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা জন্মদিন উদযাপন করতাম। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, মেয়ে তোয়ার জন্মদিনে শ্রীজিতা নিমন্ত্রিতদের জন্য খাবারের পাশাপাশি নাচ-গান ইত্যাদির ব্যবস্থাও করেছে যা আগে আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না।

আবার, উপন্যাসে দেখা যায়, সৌন্দর্যচর্চা, শারীরিক সৌন্দর্য ও পরিচর্যার অভ্যাসগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

“ বেডরুমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে শোওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল শ্রীজিতা। থাইয়ের কাছে পর্যন্ত একটা হলুদ রঙের নাইটি পড়ে হাতে-পায়ে রাতের ক্রিম মাখছিল। ... নিয়মিত চর্চা করে শরীরকে রেখেছে মেদহীন ঝরঝরে।...অফিসে যতই কাজ থাক একবার জিম না ঘুরে সে বাড়ি ফেরে না। খাওয়া-দাওয়া করে মেপে।”৩

আগে রাতে শোবার আগে ক্রিম বা অন্যান্য সৌন্দর্যপণ্য ব্যবহার আমাদের অভ্যেসে ছিল না। এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও পণ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মানুষ সৌন্দর্য চর্চায় নতুন পদ্ধতি ও পণ্য গ্রহণ করছে এবং অবশ্যই মিডিয়া, বিজ্ঞাপন তার অন্যতম কারণ। তাছাড়া আগে শরীরচর্চা ও ফিটনেস নিয়ে সচেতনতা সীমিত ছিল। এখন ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও জিম, যোগা এবং অন্যান্য ফিটনেস কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। উপন্যাসের শ্রীজিতাও তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও শারীরিক সৌন্দর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় করছে।
কারণ শ্রীজিতার কাজের একটা অংশ হল, ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলা। তাদের কনভিন্স করানো। এই কাজে ভিতরের যোগ্যতার পাশাপাশি বাইরের আকর্ষণ রাখতে পারলে সুবিধে। আজকাল সাজগোজে বেশি সময় নেয় শ্রীজিতা। ব্যাগে সংক্ষিপ্ত মেকআপ কিট রাখে সে। গালের পাফ, ঠোঁটের শেডস, চোখের রং। কারণ অফিস এবং কাজের সঙ্গে নিজেকে মানানসই করতে হয়।

আগে মেয়েরা নিজেদের যৌন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারত না। উপন্যাস অবলম্বনে দেখা যাচ্ছে - "কথা শেষ না করেই শ্রীজিতা নিজের ঠোঁট চেপে ধরেছিল অরণির বাদামি, পুরুষালি ঠোঁটে। আচমকা আক্রমণে অরণি সোফায় কাত হয়ে পড়ে যেতে- যেতে নিজেকে সামলেছিল। তারপর গ্রহণ করেছিল আহ্বান।"৪

এখন মেয়েরা শুধুমাত্র তাদের যৌন ইচ্ছা প্রকাশই করছে না তারা রীতিমত ছেলেদের উদ্‌বুদ্ধ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা বা পিছপা হয়না। মেয়েদের মধ্যে এই লজ্জা বা সংকীর্ণতার বোধ কমে যাচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্বিশেষে তাদের অনুভূতি এবং ইচ্ছা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে। এই সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে শিক্ষার প্রসার, লিঙ্গ সমতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন ।

মেয়েদের জীবন যে শুধুমাত্র আমাদের চিরপরিচিত রান্নাঘরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা উপন্যাসের চরিত্র আজকের স্বাধীনচেতা মেয়ে শ্রীজিতার তার স্বামীর উদ্দেশ্যে বলা কথার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি —

শ্রীজিতা বলেছিল, " আমি সারাদিন হেঁশেলে থাকব এরকম কোন চুক্তি কি তোমার সঙ্গে হয়েছিল?.... তুমি বরং রান্না শিখে নাও। ...আমি আমার কাজে আরও বেশি করে মন দেব বিধান। আমি ক্যারিয়ারে মন দেব। আমার খুব ইচ্ছে, বাইরে কোথাও গিয়ে মার্কেটিং এর উপর ডিগ্রি নিয়ে আসি। ....রান্নাঘরের উচ্ছে, বেগুনে আমার আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"৫

প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মেয়েদের ঘরের কাজ এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ করেছে, আর ছেলেদেরকে বাইরে কাজ করে অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে শেখানো হয়েছে। কিন্তু আজকের সমাজে এই ধারণাগুলোর যে পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা সোহিনীর বিধানকে বলা কথাগুলো থেকে অনুমান করতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। মেয়েরা এখন শুধু ঘরের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা বাইরের কাজেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে, ক্যারিয়ার সচেতন হচ্ছে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। একইভাবে, ছেলেদেরও দায়িত্ব বাইরের কাজের সঙ্গে ঘরের কাজ এবং পরিবারের যত্ন নেওয়া। এই ধারণা বা ভাবনার পরিবর্তনগুলো লিঙ্গসমতার দিকে আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আবার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিজের হাতে থাকলে যে এখন আর একটা মেয়েকে বিয়েতে থেকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তারই উদাহরণ উপন্যাসের শ্রীজিতা। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই,

"শ্রীজিতা নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে। ... তোয়া, মিনু আর সে তিনজনই মেয়ে। ফলে সিকিউরিটি দেখতে হয়েছে। ব্যাংক লোনে কেনা হলেও, ডাউন পেমেন্টের জন্য অফিস সাহায্য করেছে। বাড়িতে লোক কমলেও, কাজের লোক কমায়নি শ্রীজিতা। বরং একটা- দুটো করে গ্যাজেট কিনে ফেলেছে। ওয়াশিং মেশিন, ইনডাকশন, মাইক্রোআভেন। ৬

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মেয়েদের জীবনে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। যখন একজন মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়, তখন সে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে এবং নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে পারে। এই স্বাধীনতা তাকে বিয়ে করার বা বিয়েতে থেকে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দেয়। সে ইচ্ছা করলে একাই থাকতে পারে এবং নিজের জীবন নিজের শর্তে চালাতে পারে। তাকে স্বামী বা কারো উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাদের সমাজে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। এই শ্রীজিতার মধ্যে কিভাবে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় তা আমরা দেখতে পাই,

"শ্রীজিতা এখন বুঝতে শিখেছে, পোশাক তো অতি সামান্য, শরীর নিয়ে বস্তাপচা মূল্যবোধ আসলে এক ধরনের ভ্রান্তি। অক্ষম, অযোগ্য মানুষ এসব নিয়ে বড়াই করে। মিইয়ে যাওয়া পাঁপড়ের মতো অর্থহীন জীবনকে তারা বলে নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র। যত দিন যাচ্ছে শ্রীজিতা বুঝতে পারছে, পবিত্র জীবন বলে আসলে কিছু হয় না। জীবনকে ভোগ করাটাও একটা যোগ্যতা। এখন শরীর দিয়ে পুরুষকে মোহাচ্ছন্ন করতে, কাজ আদায় করে নিতে, এমনকী অতৃপ্ত যৌন তেষ্টা মেটাতেও তার মনে কোনও দ্বিধা হয় না। এটাকে সে প্রয়োজন বলে মনে করে।"৭

শ্রীজিতার এই উপলব্ধি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। পোশাক এবং শরীর নিয়ে যে প্রথাগত ধারনা, তা প্রকৃতপক্ষে একটি ভ্রান্তি, যা সমাজ একটা মেয়ের উপর ছেলেবেলা থেকেই চাপিয়ে দেয়। সময়ের

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত মানসিকতা থেকে শ্রীজিতা এখন বুঝতে শিখেছে যে পবিত্র জীবন বলে কিছু নেই, বরং জীবনের সমস্ত দিককে উপভোগ করাও একটি যোগ্যতা।
শরীরের মাধ্যমে পুরুষদের আকৃষ্ট করা, নিজের কাজ সাধন করা, বা নিজের যৌন চাহিদা মেটানোকে শ্রীজিতা এখন প্রয়োজনীয় মনে করে। এই উপলব্ধি তাকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে, যেখানে সে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদাকে মূল্য দেয় এবং সমাজের প্রচলিত ধারনাগুলোর বাইরে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। উপন্যাসে আমরা দেখি,

“শ্রীজিতা ঠিক করেছে, শিগগিরই গাড়ি কিনে নেবে। পার্টি-টার্টিতে গেলে রাতে ফেরা মুশকিল। লিফ্ট নিতে হয় ।”৮

শ্রীজিতার গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত তার আর্থিক স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার প্রতিফলন। মেয়েদের পার্টি করা, পাবে যাওয়া, এবং নিজের মতো করে জীবনযাপন করা বিশ্বায়নের ফল । বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মেয়েদের জন্য নতুন সুযোগ এবং স্বাধীনতার দরজা খুলে দিয়েছে। এখন মেয়েরা নিজস্ব পছন্দমতো জীবনযাপন করতে পারে, এবং শ্রীজিতার মতো তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গাড়ি কেনা তার জন্য শুধু একটি আর্থিক সক্ষমতার প্রতীক নয়, বরং এটি তার স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তারও প্রতীক। এর মাধ্যমে সে যেকোনো সময় নিজে থেকে চলাফেরা করতে পারবে এবং নিজের জীবনকে নিজের নিয়মে চালাতে পারবে। এটি অবশ্যই বিশ্বায়ন এবং সমাজের পরিবর্তনের ফল, যেখানে মেয়েরা তাদের সম্ভাবনা এবং ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে।

শ্রীজিতা ঘাড়ে ক্রিম লাগাতে-লাগাতে বলেছিল, "বিধান, তুমি কী বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি।.... একটা কথা শুনে রাখো, আমি মেয়েকে আমার মতো করে মানুষ করব। ওর ধ্যান-ধারণা, জীবন বিশ্বাস যেন আমার মতো হয়। বদ্ধ এঁদো পানা পুকুরের মতো জীবন ও বহন করবে না। কনভেন্টে পড়বে, হস্টেলে থাকবে, বিদেশে যাবে। সে তার বাবার মিডিওকার জীবন চিনবে না। সে যেমন লেখাপড়া করবে, তেমন বন্ধুবান্ধব, পার্টি চিনবে। তোয়াকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।”৯

শ্রীজিতার স্বামী বিধানের "মিডিওকার" জীবন থেকে তার মেয়েকে দূরে রাখার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা শ্রীজিতার মূল্যবোধের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এই পরিবর্তন শ্রীজিতার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, যেখানে সে বুঝেছে যে জীবনে স্বাধীনতা, সুযোগ এবং অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মূল্যবোধের এই পরিবর্তন তার মেয়ের প্রতি তার উচ্চাশা এবং আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন। সে চায়না যে তার মেয়ে একটি সীমাবদ্ধ জীবনযাপন করুক, বরং সে চায় তার মেয়ে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করুক এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। শ্রীজিতা চায় তার মেয়ে শুধুমাত্র পড়াশোনায় নয়, সামাজিক জীবনেও সক্রিয় হোক।

উপন্যাসের অন্য চরিত্র স্বর্ণার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই—
" ঝুমুর, এই বয়সেই বুঝেছি....আমাদের ছি-ছি বলা খুব সহজ। আমাদের শরীর যখন আমাদের অনুমতি ছাড়া অন্যরা ব্যবহার করে, তখন ঠিক আছে। আমরা ব্যবহার করলে ছি-ছি?”১০

এখানে স্বর্ণার এই পরিবর্তিত মানসিকতা, নিজের জীবন নিজের শরীর স্বাধীনভাবে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার মানসিকতা এবং স্বাধীনতা অবশ্যই বিশ্বায়নের দান। শরীর নিয়ে শুচিবাইগ্রস্ততা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে আজকের স্বর্ণা-শ্রীজিতারা। আবার দেখা যায়,

শ্রীজিতা বলে “মিনু, একটা জরুরি কাজে আমি বেরোচ্ছি।’ মিনু অবাক হয়ে তাকাল। চাপা গলায় বলল, ‘এত রাতে?’ শ্রীজিতা অসন্তুষ্ট গলায় বলল, ‘রাত কোথায়? মোটে তো ন'টা বাজে। আমার অফিসের কাজ সবসময়ের।” ১১

দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট মেয়েরা সন্ধ্যের পর আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কর্মব্যস্ত জীবন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শ্রীজিতার মধ্য দিয়ে এই ধারণা ভাঙতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, উপন্যাসের চরিত্র সাত বছরের ছোট্ট তোয়ার মুখে শোনা যায় —
“ তোয়া বলেছিল– ‘ফ্র্যান্ড।... ওদের একটা ব্যালকনিতে অনেক গাছ। আমি হাত দিলেই বলে, ‘দেবাদৃতা, ডোন্ট টাচ। পাপা রাগ করবে। দিস ইজ মাই পাপাজ গার্ডেন।’ ...আমিও বাগান করব। পিউ গাছে হাত দিলে বলব, ‘ডোন্ট টাচ। দিস ইজ মাই পাপাজ গার্ডেন।” ১২
আবার,

"শ্রীজিতা এবার গম্ভীর গলা করে বলল, 'ইটস টু মাচ তোয়া। সে যদি আসে নিশ্চয়ই গেট থেকে চলে যাবে না...হি উইল ওয়েট ফর ইউ।"১৩

বর্তমানে আন্তর্জাতিক কাজের বাজারে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বাড়ছে, তাই আমাদের বাবা মায়েরা চান সন্তান যাতে ভবিষ্যতে ভালো সুযোগ পায়। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে গেলে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা এক ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়ে থাকে। তাই ছোট্ট তোয়ার মুখেও বাংলার সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে মিশে গেছে ইংরেজি ভাষা।

সুতরাং, নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক দাবির মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ দাবি বা বোধ উঠে এসেছিল, যে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর না হলে প্রাথমিকভাবে পিতৃতন্ত্রের আগল থেকে মুক্তি পাওয়া দূরের কথা, কোনরকম লড়াইও সম্ভব নয়, সেটা ধীরে ধীরে প্রমাণ হয়েছে এবং এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে যৌক্তিকতার সাহায্য নিয়ে নারী যে পিতৃতন্ত্রের পুরনো ধরনের আগল ভাঙার ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে তা বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন সত্যি সেরকম উপন্যাসের মধ্যেও এই বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। একুশ শতকেরই লেখক হওয়ার সুবাদে এই পরিবর্তনকে, তাঁর চারপাশকে উপস্থাপন করেছেন প্রচেত গুপ্ত তাঁর 'ধুলোবালির জীবন' উপন্যাসে। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীজিতার উচ্চকিত প্রত্যাশা বা মনোভাবকে আমরা বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করতে পারি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে মেয়েরা মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বেরিয়ে আসছে, বা বলা ভালো, বেরিয়ে আসার প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, শ্রীজিতার স্বামী বিধানের মধ্যবিত্ত জীবন থেকে তার মেয়েকে দূরে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রীজিতার এই পরিবর্তিত মূল্যবোধেরই প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। সে চায় তার মেয়ে তোয়া একটা প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ জীবনের স্বাদ পাক, যেখানে লিঙ্গবৈষম্য, পুরনো ধ্যানধারণা, এবং সঙ্কীর্ণ মানসিকতার কোনো স্থান নেই। শুধুমাত্র মেয়ের ক্ষেত্রে নয়, নিজের জীবনেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিরাচরিত এই বস্তাপচা মূল্যবোধকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তথাকথিত আধুনিক জীবনকে বরণ করে নেয়ার প্রতিনিয়ত প্রয়াসকে দেখা যায়।

তথ্যসূত্র

১. গুপ্ত, প্রচেত, ' ধুলোবালির জীবন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৯, পৃ- ১১৬-১১৭

২. তদেব

৩. তদেব, পৃ- ৩৩-৩৪

৪. তদেব, পৃ- ৫৯

৫. তদেব, পৃ- ১১

৬. তদেব

৭. তদেব, পৃ- ১৩

৮. তদেব, পৃ- ১২

৯. তদেব, পৃ- ৩৬

১০. তদেব, পৃ- ৮৮

১১. তদেব, পৃ- ১০৬

১২. তদেব,পৃ- ২৫

১৩. তদেব